Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-II, January 2024, Page No.44-50
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

‘হুলমারার ভমরা মাঝি’ নকশাল নয়; সাধারণ চাষী

নবগোপাল সামন্ত

রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বিভাগ -১, যোগদা সৎসঙ্গ পালপাড়া মহাবিদ্যালয় বি.এড বিভাগ, এম.এ., এম.ফিল, নেট, এম.এড, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

In the seventies of the 20th century in Bengali Literature, a brilliant astrologer Bhagirath Mishra’s unique work ‘Hulmarar Bhamra Majhi’ is a story. As a result of the lack of rain, Bhamra could not grow crops on the land of Bankubihari Aich, the landlord of Hulmara. So, the husband and wife joined the party procession in Bishtupur in the hope of getting some grain and water but did not get food. From hunger themselves at home, hoping for one packet of puffed rice for their three-year-old starving children, they wandered around the city’s agricultural fair and picked up a little cake lying under their feet. When they were insulted by the disguised Bhamra Majhi, they lost their anger and kicked the ‘disguised Bhamra Majhi’ in the stomach. The real Hulmara’s Bhamra Majhi is branded as a Naxalite in an ugly political hunt of the minister- bureaucrat cherished regime based on his death.

Keywords: Common class, Naxalism, Bureaucratic regime, Conflict between Reality and Model, Values.

সাধারণ শ্রেণীর মানুষের সম্পর্কে বলা হয়, ঈশ্বরের পা থেকে এদের উৎপত্তি। এদের কাজ হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের সেবা করা। ভারতীয় সমাজে বর্ণাশ্রমে এঁরা শুদ্র; আধুনিক ভারতীয় সামাজিক কাঠামোয় এদেরই সাধারণ শ্রেণীর মানুষ বা নিম্নবর্গ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই আলোচনায় সাধারণ শ্রেণীর উৎসকে অবলম্বন করেই আধুনিক কালে বিশ শতকের সত্তর দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ভগীরথ মিশ্রের আবির্ভাব। একেবারেই গ্রামীণ শিল্পী: তৃনমূল স্তর থেকে সংগ্রাম করে বেড়ে ওঠা। এই শিল্পীর লেখনীর অভিনবত্ব, দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা তাঁর গল্পের স্বাদ এনেছে ভিন্নমাত্রা। পেশা হিসেবে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে এক্সিজিকিউটিভ পদে বহাল থাকাকালীন পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন প্রান্তে তদারকির কাজে ঘুরে বেড়ান। সেই সূত্রে তিনি পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, অবিভক্ত মেদিনীপুরের সমকালীন ইতিহাস; সাধারণ শ্রেণীর মানুষের কর্মময় জনজীবন চাক্ষুষ করেন। সেই সকল সাধারণ মানুষই তাঁর কথাসাহিত্য কলেবরের দেহকোষ।

‘মুষলপর্ব’ উপন্যাস সংকলন রচনা করতে গিয়ে ‘ভূমিকা’ অংশে লেখক ভগীরথ মিশ্র মন্তব্য করেন — “আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম এক শুদ্ধ নির্লোভ সকালে। কৌরব-পান্ডবে লড়াই হবে, এমনটা খবর

পেয়েছিলাম লোকমুখে। আমরা যুদ্ধে বেরিয়েছিলাম। আমরা আমাদের শত শত চোখে স্বপ্নের কজ্জল পরে নিয়েছিলাম। আমরা রক্তিম রঙে রাঙিয়ে ছিলাম যে যার বসন।

তারপর... যতই বেলা বাড়ল,... তপ্ত আর রুদ্র হল পৃথিবী। রুক্ষ আর অকরুন হল। অর্থকরী দুনিয়াটা এদেশের হৃদপিন্ডে সরাসরি থাবা বসিয়ে দিল। এছাড়াও প্রতি মুহূর্তে চারপাশে কত রকমের যে ওলট-পালট ঘটে যেতে লাগল!

আমাদের বুকের মধ্যেও তিল তিল তৈরি হল অহং। অহং আর দম্ভ। দম্ভ আর মাৎসর্য। মাৎসর্য আর লোভ। আমাদের হৃদপিন্ডের কাছাকাছি লোভের একটা ভরভরন্ত মৌচাক জমল। আমাদের স্বপ্নটা শেষ অবধি অহং, দম্ভ, লোভ আর উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বদলে গেল।

শেষ অবধি আমাদের যুদ্ধটা দাঁড়াল একদল লোভী ও অহংকারী মানুষের সঙ্গে আর-একদল লোভী ও অহংকারী মানুষের লড়াই। "এই দুই দলের সংঘর্ষে চিরকাল পর্যুদস্ত হয়ে এসেছে সাধারণ মানুষ। পচনশীল সমাজের বুকে যাদের অস্তিত্ব নিয়ে কেউই ভাবে না। নিজেদের অহং, মাৎসর্য, দম্ভ, আর সীমাহীন লোভে ক্রমশই এরা দীর্ণশীর্ণ। সাধারণ এই মাটির মানুষদের নিয়ে তাঁর রচিত গল্প 'হুলমারার ভমরা মাঝি'। গল্পে 'সাধারণ' অর্থে ভগীরথ মিশ্র যে সকল মানুষের কথা বলেন তারা ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় চারটি বর্ণের মধ্যে নিম্নবর্গে অবস্থান করে। অর্থনৈতিক ভাবে এরা অন্য বর্গের তুলনায় হীন; ক্ষমতা ভোগের সাপেক্ষে অন্য পরিসর মানুষের তুলনায় দুর্বল; শিক্ষাগত যোগ্যতায় নেই বললে চলে এবং লিঙ্গগত ভাবেও এরা অন্যের নিকট অবদমিত। সত্তর দশকের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক অস্থিরতায় তিনি যে মানুষদের আত্মানুসন্ধানী তাদের কাছে দারিদ্র হল নিত্য সঙ্গী। চাষবাস, কামার, কুমোর,বাদ্যকার, গুনিন, লোকশিল্প প্রভৃতির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। গল্পে উল্লেখিত হুলমারার ভমরা মাঝি একজন চাষী। অনাবৃষ্টির ফলে তার খেতে ফসল নেই। জমি গেছে শুকিয়ে। বাঁধের জোড়ে জল নেই। বছরটা পরিণত হয়েছে 'খাটারশাল অজন্মা'। মন্বন্তরে পরিণত আকাশ জুড়ে চক্কর মারছে ডোমচিল আর শকুনের ঝাঁক— "দেশ গাঁ'র আগাশ জুড়ে শাগনা উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। বচ্ছরটাই খাটারশাল অজন্মা। নুয়ান আর কেলাশ ধান হয়নি। আমনও নামমাত্র। এখন এই ফাগুনের পয়লা হপ্তায় বাধেঁ-জোড়ে জল নেই। রুখা ধরিত্রীর বুক খাঁ খাঁ। তপ্ত নীল আকাশ জুড়ে ডোমচিলেরা চক্কর মারে। ঢেপুয়া খালের তলায় থিকথিকে বত্ জমেছে।"[১]

অথচ কাজ কর্মের দাবি নিয়ে যত্রতত্র চলছে পার্টির বাবুদের মিছিল। এই মিছিলে যোগদান করলে খাওয়া-দাওয়া ফ্রিতে পাওয়া যায়। তাই ভমরা কিছু দানাপানি আশায় সব ধরনের মিছিলে সে যোগদান করে। যেদিন বিষ্টুপুরে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সেদিনও মাথাপিছু দুই কেজি গম পাওয়ার আশায় বউকে নিয়ে ভমরা যোগদেয় মিছিলে। মিটিং এর শেষে তাকিয়ে থাকে খাবারে আশায়। কিন্তু নতুন ভিডিও সাহেব জাতে পাকাল মাছ। মিষ্টি ভাষায় জানিয়ে দেয় স্টকে গম, চাল, দানাপানি বাড়ন্ত। ফলে স্বামী-স্ত্রীতে মিলে খিদের জ্বালায় রাস্তার কলতলা থেকে পেট ভর্তি করে জল খায়। তারপর সে স্ত্রী মালতীকে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে এক ঠোঙা মুড়ির জন্য। বাড়িতে তার তিন বছরে অনাহারী শিশুসন্তানের মুখ যতই মনে পড়ে ততই তার ক্ষুধার্ত পেট আর দিশাহীন মাথা চাগাড় দিয়ে ওঠে। এই বড়বাবুদের বিশাল শহরের বুকে এক ঠোঙ্গা মুড়ি পাওয়ার আশায় ভিক্ষা করতে লজ্জা করলেও সে হাত পেতেছে সবার কাছে। কৃষিমেলায় ঘুরে ঘুরে রসনাতৃপ্ত খাবারে ঘ্রাণ গ্রহণ করলেও উপোসী শিশুসন্তানের জন্য এক তিলও স্বস্তি নেই তার —

"এই ঐশ্বর্যময় স্বর্গোদ্যানকে একটা নির্বান্ধব ভয়ঙ্কর শ্মশানভূমি বলে মনে হয় ভমরা মাঝির।"[২] এমনকি সারাদিন নিজেদের অভুক্ত পেটে ইঁদুরখানা ধারালো নখ দিয়ে আঁচড় মারে।

ক্ষুধার্ত পেটে শহরের মেলাকে তার শত্রুপুরী মনে হয়। সেখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না। হঠাৎ শহুরে 'বিটি-ছ্যালাদের' চাষের নিত্য দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয় সে— "ইয়ারা কুন দ্যাশের মুনিশ-কামিন আইজ্ঞা? বড় আমুদ কইরে ধান রুইছে গা!। লাচত্যে লাচত্যে এক্কেরে দলকাঁই দিচ্ছে ভুঁই। মেইয়া-মদ্দ মিল্যে চোখে চোখ ঠারছে কেমন!"[৩] তাদের পরনে আঁটোসাঁটো শাড়ি, ঠোঁটের কোণে হাঁসি। পায়ের তালে তাল মিলিয়ে নুয়ে পড়ে ধান রুইছে। মাঝে-মাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে বেলা দেখে। মনে হয় ক্লান্তি তাদের মানায় না। তরুণ-তরুণীদের চাষের নৃত্য দেখে ভমরার মনে বৈপরীত্য মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনের মধ্যে গাঢ় সংশয় দেখা দেয়। তার নিজের অভিজ্ঞতা মনে করে— " মোদের চাষের টাইমে, হায় বাবু গ',ত্যাখন গা' টলমলায়, মাথা ঘুরঘুরায়, প্যাটের চামে ছুঁচ ফুটায়। ত্যাখন ক্যাবল একটা ভাবনাই জোঁকের পারা কামড়ে থাকে মগজে। কখন এক পাই মুড়ি-ভুজা মিলব্যেক, ছ' ঘড়িটাক ব্যালা হলে। ত্যাখন মনে মনে একখান্ গানই গাই মোরা: হেই বাবা সূয্যিদেব! জলদি জলদি ছুটো হে আকাশে। ছ'ঘড়িটা বাজাই দাও বাপ জলদি।"[৪]

এমনকি মেলায় প্রদর্শিত ছদ্মবেশী চাষী-চাষীর বউ'র মূর্তিগুলোকে প্রথম ঠাকুর বলে ভ্রম হলেও জানতে পারে 'ইট্যা চাষার মূর্তি? আর উট্যা চাষার বউ?' মূর্তিগুলোর আকার প্রকৃতি দেখে সে অবাক হয়— "এ কুন দ্যাশের চাষা আইজ্ঞা? কি খেইয়্যেঁ অমন পাকা-কাঁঠালের পারা গতরটি বান্যিয়েছে? সে দ্যাশে কি বুনা ওল আর বাঁওড় আলুর জোর বেশি আইজ্ঞা?"[৫] অর্থাৎ বাস্তবে চাষিবাসি মানুষের আকৃতি প্রকৃতি আর প্রতিকল্পের চেহারা বেমানান। সাধারণত চাষারা এমন সুপুরুষ ও সুদর্শন চেহারায় হতে পারে না। এমনকি সে একজন চাষী হিসাবে নাদুস-নুদুস কোন চেহারার চাষীকে আজন্মেও দেখেনি। তার ধারনায় — "চাষা হবে ঠিক চামচিকাটির মতো। তার পেটের চাম পিঠের সঙ্গে মিশে যাবে। সে কাঠির মত পা' দু'খান্ টেনে টেনে হেঁটে চলে বেড়াবে। আর চাষীর বউ? ষোল বচ্ছর থেকে এক নাগাড়ে বিয়োতে বিয়োতে, আর কাঁচা গতরে ভোখ খিঁচে খিঁচে খাটতে খাটতে, বিশ-বাইশ না পেরোতে তাকে দেখতে লাগবে ঠিক যেন চৈত্রের বগা লাউটি। ছেঁড়াফাড়া এক টুকরো ন্যাকড়ার আড়ালে তার রুখাশুখা শরীরটা যখন বেলায় অবেলায় কেঁপে কেঁপে উঠবে। সে নুয়ে পড়লে দুলতে থাকবে পোড়া বেগুনের মতো বুক।"[৬] তাই সুপুরুষ চাষা বউকে দেখে তার আক্ষেপ হয়। মূর্তির কারিগরের কাছে আপত্তি জানায় তাদের গায়ে কাঁচা মাটি মাখিয়ে স্ট্যাচু করে দিতে। যাতে তারা শহরের বড়লোকদের আনন্দ দিয়ে কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারে। এমনকি ক্ষণিকের জন্য হলেও নিজেদের চেহার পরিবর্তনের আনন্দ তারা পেতে চায়— "মাটির ফসল খেইয়্যেঁ তো মোট্টা হল্যম নাই এ জনমে। গায়-গতরে মাটি লেপ্যে মোট্টা হই।"[৭] বস্তুত ভমরা মাঝির দৃষ্টিতে লেখক সুকৌশলে ভারতবর্ষের কৃষকদের অবস্থানটি সুস্পষ্ট করেন। বাস্তব এবং মডেল এই দুইয়ের ব্যবধান ও বৈপরীত্য বুঝিয়ে দেন।

গল্পে মন্ত্রী-আমলা লালিত শাসনতন্ত্রের একটা কুৎসিত চেহারা ফুটে ওঠে। যার রাজনৈতিক শিকার গ্রামের সাধারণ মূর্খ চাষীরা। এক ঠোঙ্গা মুড়ির আশায় যে ভমরা মাঝি সারা সকাল থেকে হাপিত্যেসে ঘুরে বেড়িয়েছে, এক টুকরো রুটির খন্ড মাটিতে পড়ে থাকলে সে তো লুফে নেবেই। কিন্তু এই অনাহারের যন্ত্রনা ছদ্মবেশী 'ভমরা মাঝি' জানেনা। সে রাজনৈতিক নেতাদের আমন্ত্রণে বিষ্টুপুরে 'কৃষিমেলায়' প্রদর্শনী

দিতে এসেছে। ভালো করে প্রদর্শনী দিলে নেতাদের হাত থেকে মেডেল হিসেবে রূপার কাস্তে পাবে। যেখানে সাধারণ চাষী হিসেবে হুল মারার ভমরা মাঝি সম্মান পেলনা সেখানে রাজনৈতিক ছলনায় মিথ্যে 'হুল মারার ভমরা মাঝি'র হাতে রূপোর কাস্তে তুলে দেওয়া বিলাসিতা মাত্র। যেখানে দীনেশ দাস সাধারণ কৃষকদের রুখে দাঁড়ানোর অস্ত্র হিসেবে 'কাস্তে'র জয়গান গায় — "বেয়নেট হোক যত ধারালো— / কাস্তেটা ধার দিয়ো, বন্ধু! / শেল আর বম হোক ভারালো / কাস্তেটা শান দিয়ো, বন্ধু।...দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে / আসে ওই! চেয়ে দ্যাখো বন্ধু! / কাস্তেটা রেখেছো কি শানায়ে / এ-মাটির কাস্তেটা, বন্ধু!"[৮] অথচ সেখানে রাজনৈতিক নেতাদের কাছে সাধারণ চাষীরা মূল্যহীন। তাদের যথোচিত সম্মান পুরস্কার দেওয়া তো দূরের কথা ভমরা মাঝিকে শুনতে হয়েছে 'লোকটা লকশাল হে'।[৯] এমনকি ছদ্মবেশী ভমরা মাঝিও চরমভাবে তাকে তাচ্ছিল্য করে — "ছ্যা ছ্যা, শেষকালে লোকের আঁইঠা রুটি কুড়িয়ে খেলি রে ভমরা? ছ্যা ছ্যা। তুই মানুষ না কুকোর রে? ইলচি করে আরও অনেক কথাই বলেছিল লোকটা।"[১০] পেটে একরাশ ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ট ভমরা মাঝি, সারাদিনের উপোসী যন্ত্রনা সহ্য করতে পারলেও, অপমান সহ্য করতে পারে না। এ অপমানবোধ কেবল তার পুত্র সন্তানের জন্য নয়, বাংলার অনাহারী দরিদ্র পিতার আত্মসম্মানে আঘাত করে। সে চন্ডালের মত রেগে যায়। ফলস্বরূপ সে দিশেহারা হয়ে ছদ্মবেশী ভমরা মাঝির পেটে সজোরে লাথি মারে। আসলে খালি পেটে ঠিক যেমন ধর্মই হয় না তেমনি খালি পেট থেকেই যত রোগের উৎপত্তি। পঞ্চইন্দ্রিয় তখন দুর্বল হয়ে পড়ে। আর সেই দুর্বলতা থেকে দেহের মধ্যে জন্ম নেয় রিপু। সেই রিপুর বশবর্তী হয়ে 'হুলমারার ভমরা মাঝি' দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে রেগে লাথিটা মারে। প্রচন্ড আঘাতে ছদ্মবেশী ভমরা মাঝি মারা যায়। শাস্তি সুলভ ভমরা মাঝির হাজত বাস হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক নেতারা তাদের সুবিধা লাভের দালালি শুরু করে। মন্ত্রির অনুষ্ঠিত 'কৃষি মেলায়' এ ধরনের হত্যাকে নকশালী হিসেবে সন্দেহ করে। সাধারণ চাষী থেকে তকমা পায় নকশাল। এই ঘটনা প্রেক্ষিতে গল্পটির ঐতিহাসিক সময় এবং প্রেক্ষাপট হিসেবে সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে জেনে রাখা আবশ্যক। তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে বিষয়বস্তুর ভিতরকার সমাজনীতি ও অর্থনীতি। কিভাবে সমাজনীতি ও অর্থনীতি শেষ পর্যন্ত রাজনীতির পটভূমি তৈরি করে।

পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার 'নকশালবাড়ি' থেকে এই নকশাল আন্দোলনের সূত্রপাত। ১৯৬৭ সালে ২৫শে মে তারিখ থেকে এই বিদ্রোহের সূচনা। নকশালবাড়ি গ্রামে কৃষকদের স্থানীয় ভূস্বামীরা ভাড়াটে গুন্ডার সাহায্যে উৎখাত করে। সর্বহারা কৃষকদের শোষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য মাও সেতুং আদর্শের অনুসারী কমিউনিস্ট নেতা চারু মজুমদারের নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়। মহাশ্বেতা দেবী 'অগ্নিগর্ভ' গ্রন্থের ভূমিকায় এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে লিখেন— "১৯৬৭-র মে-জুনে নকশালবাড়ি অঞ্চলে সংঘটিত আন্দোলনের প্রেক্ষাপট উপস্থাপনা, বিষয়টির পুনরালোচনার সহায়ক হবে। দার্জিলিং জেলার নকশাল- বাড়ি, খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া অঞ্চলের বেশির ভাগ অধিবাসীই আদিবাসী, ভূমিহীন চাষী। তাঁদের মধ্যে আছেন মেদি, লেপচা, ভুটিয়া, সাওতাল, ওঁরাও, রাজবংশী এবং গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষ। স্থানীয় জোতদাররা দীর্ঘকালীন "আধিয়ার" ব্যবস্থায় তাঁদের ওপর নিজেদের শোষণ অব্যাহত রাখেন। এ ব্যবস্থার নিয়মানুসারে জোতদারেরা নিভূঁই চাষীকে বীজধান, লাঙল-বলদ, খাদ্য ও সামান্য পয়সা দিয়ে নিজের খেতে কাজে লাগান, ফসলের সিংহভাগ ঘরে তোলেন। এর বিরুদ্ধেই চাষীর ক্ষোভ ও প্রতিবাদ। ফসলের সিংহভাগ জোতদারের ঘরে যাওয়া, সামান্য পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে চাষীকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা, এবং সর্বোপরি চাষীর সেই আদিম জমির ক্ষুধা। এইরকম বিক্ষোভ ও সংঘর্ষের প্রেক্ষিতেই ১৯৫৪ সালে সরকার

"এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট" পাস করেন। এই আইনের মুখ্য বিষয় হল, কোন ব্যক্তি মোট ২৫ একরের বেশি জমি রাখতে পারবেন না। এই আইন প্রণয়নের পেছনের শুভেচ্ছাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কার্যকালে জমির মালিক সামান্য জমিই খোয়ান; বেনামে সমস্ত জমিই তাঁদের থেকে যায়। ১৯৭১ সালে, কৃষি জমির পরিবার ভিত্তিক সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে যে আইন (সংশোধিত) পাস করা হয়, তাতেও কোন লাভ হয়নি। সকলেই জানেন, আইনটিতে মেছো ঘেরি, চা-বাগান শিল্পকারখানা ইত্যাদি নামের আড়ালে হাজার-হাজার একর কৃষিজমি লুকিয়ে রাখার বিরুদ্ধে কোন কথা নেই । ... এই রকম অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধেই নকশালবাড়ির কৃষকশ্রেণী একদিন সংগঠিত শক্তি নিয়ে বিদ্রোহের পথে নামেন। সে আন্দোলন, একই প্রকারে বঞ্চিত-শোষিত কৃষককে অন্ধ্রে কেরলে-তামিলনাড়ু বিহার ও ওড়িশায় প্রেরণা যুগিয়েছিল। নকশালবাড়ি আন্দোলন নামে যা অভিহিত, ...।"[১১]

E. M. Foster তাঁর 'Aspect of the Novel' গ্রন্থে বলেছেন- " It is never possible to deny time inside the fabric of his novel"[১২] অর্থাৎ সময়কে অস্বীকার করে কোনো আখ্যান নির্মিত হতে পারে না। 'Time and the Novel' গ্রন্থে A. Mendilow বলেন, লেখক, বিষয়বস্তু, বর্ণনা পদ্ধতি, দৃষ্টিকোণ, চরিত্র প্রভৃতি সময়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্তর দশকে নকশাল আন্দোলন, ভূমি ব্যবস্থা, অপারেশন বর্গা যা সমগ্র পশ্চিমবাংলার বুকে গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তন আনে। লেখকও তৎকালীন সরকারি দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সে সূত্রে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রত্যক্ষদর্শী। গল্পেও তিনি সেই সময় ও অবস্থার স্বরূপ তুলে ধরেন— "ওই হুলমারা-বগ্ ডহরার দিকটাতেই শালারা মৌচাক বেঁধেছে। গভীর রাতে মিটিং করছে খড়কাটার জংগলে।"[১৩] এমনকি তারা সুযোগ বুঝে বিভিন্ন মিটিং মিছিলের উপর আক্রমণ করে। এর জন্য স্থানীয় নেতারা এবং ভূস্বামীরা পুলিশদের তাগাদা দেয় তাদের গ্রেফতার করতে। পুলিশেরাও দিশেহারা। তারা গোপনে সন্ধান পেয়েছে এই সকল উগ্রপন্থীদের সঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রী ও উঁচু পদের মানুষের যোগাযোগ রয়েছে। কালের নিয়মে এই নকশালরা যদি রাজ্যের গদিতে আসে তাহলে অত্যাচারী পুলিশেরা বিপদে পড়বে। তাছাড়া বর্তমান মন্ত্রীর মান ভাঙাতে ভমরা চাষীকে অত্যাচার করলে পরের দিন সমগ্র বিষ্টুপুরে উগ্রপন্থীরা বন্ধ ডেকে দিতে পারে। এই অবস্থায় পুলিশেরা নিদারুণ হয়ে তাকে বলে— "তুই শালা যে ভি. আই. পি হয়ে যাচ্ছিস রে ক্রমশ।"[১৪]

অন্যদিকে রাজনৈতিক ফাঁদে পড়ে ভমরা মাঝি দিশেহারা। সবাইকে সহজভাবে বিশ্বাস করে সত্য কথা বললেও কেউই তাকে বিশ্বাস করে না। বাড়িতে তার অনাহারী পুত্র ও পিসি এবং জেলের বাইরে সারারাত কন্দনরতা স্ত্রী মালতীর কথা ভেবে বারবার ছেড়ে দিতে কাকুতি-মিনতি জানায় থানার বড়বাবুকে— "আমাকে ছেড়্যে দ্যান্ হুজুর। আমার বউ একলাটি রইয়েঁছে আইজ্ঞা বাইরে। উ ভারি ডরছুটকা হুজুর। ... ঘরে মোর তিন বছরের ছা' হুজুর। থান্ডা-কাশ-জ্বর। উয়াকে ভাইলবার লেগ্যে কোউ নাই আইজ্ঞা।"[১৫] এমনকি সে বাবার মুখে শুনেছে জেলের ঘানি এবং কালাপানি পারাপারের চেয়ে মৃত্যু হওয়া অনেক ভাল। তাদের জাতে কেউ একবার জেলে গেলে চৌদ্দ পুরুষ তার হাতের জল গ্রহণ করে না। তার জাত নষ্ট হয়। সে কারণে থানার বড়বাবুকে বারবার অনুরোধ জানালেও তাকে বিদ্রুপ শুনতে হয়— " ছাড়ব? তুমি যে মানিক এই খানিক আগে একটা মার্ডার করে এলে? এখন কিছুদিন মামাবাড়ির ভাত খাও।"[১৬] শাস্তি স্বরূপ অন্তত দশ বছরের জেল হতে পারে সে কথাও তাকে জানায়। ক্রমান্বয়ে রাত বাড়ার সঙ্গে তাকে বারবার জেরা করা হয় হুলমারার ভূস্বামী বঙ্কুবিহারী আইচকে সে চেনে কিনা। আবার কোনো দল এসে তাকে নির্দেশ দিয়ে যায় জেরার জবাবে কেবল 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' বলতে। এতে সে ছাড়া পেলেও পেতে পারে।

দোটানায় পড়ে ক্রমশ মানুষের উপর থেকে সে ভরসা হারিয়ে ফেলে— "আজ যে তুলসী কাঠের মালাটি পরে, সারা অঙ্গে রসকলি এঁকে নামগান করল 'অষ্ট পহরের' থানে, কাল শুনি কোনও বেধবার পেটটি করে দিয়েছে অক্লেশে। আজ যে ল্যাতাটি বড় বড় বাখান দিলেন সরকারি আপিসে চুরি-চামারি কথা তুলে, তাকেই দেখি সইনঝা পহরে মাথায় জিয়ারের গম চাপিয়ে অন্ধকারে বনবাদাড় ভাঙছেন অবলীলায়। ভালো খ্যারাব এসব বলা ভারি শক্ত এযুগে।"[১৬] বস্তুত লেখক এই মন্তব্য সূত্রে রাজনৈতিক শিকারে জর্জরিত সাধারণ মানুষের চিত্র তুলে ধরেন।

ভমরা মাঝির জীবন বাস্তবতা অঙ্কনে ভগীরথ মিশ্র Third Person এর Omniscience of Point of view বা প্রথম পুরুষের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণকে গ্রহণ করেন। তার সামগ্রিক জীবনবৃত্তটি Type Character বা শ্রেণি প্রতিনিধিত্ব চরিত্র হিসেবে নির্মোহ ভাবে ফুটে ওঠে গল্পে। এছাড়া নাটকীয় আকস্মিকতা গল্পে লক্ষণীয়। বিশেষ করে কাহিনীর সূচনায় এবং সমাপ্তিতে এই নাটকীয় রীতি স্পষ্টত— "কুঠরিখানা আকারে আন্দাজ আট ফুট বাই আট ফুট। একটা জানলা নেই। ফুট ছয়েক ওপরে ছোট্ট ঘুলঘুলি। সামনের দিকে একটি মাত্র দরজা। মোটা লোহার রড দিয়ে বানানো রেলিংয়ের কপাট। বাইরে থেকে তালাবন্ধ।"[১৭] আর পরিসমাপ্তিতিতে দেখা যায় — "মুই কি করে জানবো হুজুর?... মুই মুরুখ্যু-সুরুখ্যু লোক, কী করে সিট্যা জানব আইজ্ঞা?"[১৮] বাস্তব ও কাল্পনিক মূর্তির মধ্য দিয়ে ভারতীয় দর্শনের অনুসারী সুন্দর নাটকীয়তা ফুটে ওঠে — "দ্যান্ না আইজ্ঞা, মোর আর মোর মালোতীর হাড়-পিঁজরায় টুকচান্ কাদো মাটি লেপ্যে। বেশ কুঁদলাটি হয়্যে মোরা বি খাড়া থাকি বাবু-বিবিদ্যার সাইক্ষ্যাতে।"[১৯]

সামগ্রিক আলোচনার সূত্রে বলা যায়, সময় সচেতন শিল্পী ভগীরথ মিশ্র তাঁর 'হুলমারার ভমরা মাঝি' গল্পে বাংলার সত্তর দশকের এক সামাজিক পটভূমি তুলে ধরেন। যেখানে দেখান আইন-প্রশাসন-জেল এসবের মধ্যে পড়ে হারিয়ে যায় গরিব চাষা ভমরা মাঝির সারল্য ও সততা। তার জীবনের এক নির্মম পরিণতি ঘটে নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে। নোংরা রাজনীতির 'হুল' বিদ্ধ হুলমারার ভমরা মাঝি জীবন যন্ত্রণায় জর্জরিত। ক্ষুধার্ত ভমরা রাগের বশবর্তী হয়ে এক ভুল কর্মই তার পুরো জীবন ও পরিবারকে খাদের মুখে দাঁড় করায়। ট্রাজেডি হিরোর ন্যায় জীবনের একটি ভুলের পথ ধরেই তার জীবনে হতাশা নেমে আসে। রাজনীতির তীক্ষ্ণ নখরে বিদ্ধ ভমরা মাঝি সুবিচারের অভাবে জেলের আঁধারে ডুকরে কাঁদে— 'প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে / বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।'(পরিশেষ /প্রশ্ন) সেই রহস্যময় অন্ধকার মাটির গর্ভ থেকে কবে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে এক প্রভাতী সূর্যের নরম আভায় শাখা-প্রশাখা মেলবে তা ভবিষ্যতই বলবে।

তথ্যসূত্র :

1) মিশ্র ভগীরথ, সেরা ৫০ টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা ৭০০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০, মাঘ ১৪১৬, পৃষ্ঠা নং — ৭৬।
2) তদেব পৃষ্ঠা নং — ৭৯।
3) তদেব পৃষ্ঠা নং — ৭৯।
4) তদেব পৃষ্ঠা নং — ৭৯।
5) তদেব পৃষ্ঠা নং — ৭৮।
6) তদেব পৃষ্ঠা নং — ৭৮।
7) তদেব পৃষ্ঠা নং — ৭৮।
8) https://www.milansagar.com/kobi/dinesh_das/kobidineshdas_kobita1.html. (কাস্তে/ দীনেশ দাস)
9) মিশ্র ভগীরথ, সেরা ৫০ টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা ৭০০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০, মাঘ ১৪১৬, পৃষ্ঠা নং — ৭৪
10) তদেব পৃষ্ঠা নং — ৭৫।
11) দেবী মহাশ্বেতা, অগ্নিগর্ভ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা -৯, ২য় মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৮৭, ভূমিকা অংশ।
12) Forster, E.M., Aspects of the Novel, Penguin-1963, page-37.
13) মিশ্র ভগীরথ, সেরা ৫০ টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা ৭০০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০, মাঘ ১৪১৬, পৃষ্ঠা নং —৭৬।
14) তদেব পৃষ্ঠা নং — ৮১।
15) তদেব পৃষ্ঠা নং — ৭৫।
16) তদেব পৃষ্ঠা নং — ৮০।
17) তদেব পৃষ্ঠা নং — ৭৪।
18) তদেব পৃষ্ঠা নং — ৮২।
19) তদেব পৃষ্ঠা নং — ৭৮।